কৃষি প্রগতি

সুস্থায়ী কৃষির লক্ষ্যে

আর্থিক সহযোগিতায় নাবার্ড
DRCSC প্রকল্প রূপায়ণে

বর্ষ ১, সংখ্যা -৪, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫

ফেলে দেওয়া কলাগাছের কাণ্ডের উপর সবজি চাষ

কলাগাছ তার জীবন চক্রে একবার মাত্র ফল ধারণ করে এবং কলা পাকার পর গাছটি কেটে ফেলে দিতে হয়। ফেলে দেওয়া কাণ্ড বাগানের চারিদিকে পড়ে আবর্জনার সৃষ্টি করে। এই ফেলে দেওয়া কলাগাছের কাণ্ডে আমরা সুন্দর সবজি বাগান তৈরি করতে পারি।

বাগান করার জন্য প্রথমে কলাগাছের কাণ্ডগুলি কেটে বাঁশের পাটাতনের উপর ছবির মতো করে সাজাতে হবে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিক বরাবর। তারপর ৫-৬ ইঞ্চি পরিধিতে ৪-৬ ইঞ্চি গভীর করে এক একটি গর্ত তৈরি করতে হবে। একটি গর্ত থেকে অপর গর্তের দূরত্ব হবে ৫-৬ ইঞ্চি। এরপর সমপরিমাণ মাটি, কম্পোস্ট ও অল্প পরিমাণ খোল (সরষে অথবা নিমখোল) সার মিশিয়ে গর্তগুলি ভরে দিতে হবে। এরপর প্রতি গর্তে একটি করে সবজির চারা বা বীজ লাগিয়ে জল দিতে হবে। কলাগাছের কাণ্ডের মধ্যে যেহেতু প্রচুর পরিমাণ জল থাকে তাই খুব সামান্য জলেই সবজি চাষ করা যায়। কলাগাছের কাণ্ডের জলে প্রচুর অণুখাদ্য থাকে যা সবজির সার হিসেবে কাজ করে। এইভাবে শীত ও গ্রীষ্ম দুটি মরশুমেই একই কাণ্ডে চাষ করা সম্ভব। এরপর ওই কাণ্ড থেকে কম্পোস্ট তৈরি করা যাবে।

ছবি : গিরিকুমার

যা আছে এবারে

- ফেলে দেওয়া কলাগাছের কাণ্ডের উপর সবজি চাষ
- কলসি সেচ
- খাদ্য ও কাজের নিরাপত্তার উদ্যোগ- ধাপ পুকুর
- কলসি সেচ – একটি ইতিবৃত্ত
- চাষিদের জন্য সুযোগ সুবিধা
- চাষের উপকরণের হদিস
- সুস্থায়ী উন্নয়নের খবরাখবর
- চিত্র সংবাদ – পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত বিভিন্ন জাতের বেগুন

প্রিয় পাঠক,

সুস্থায়ী কৃষি নিয়ে যে সমস্ত কৃষক, কৃষিকর্মী, ও সংগঠন নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন তাদের কাছে নানান প্রযুক্তি, নতুন ধারণা, ফসল, চাষের ইতিবৃত্ত এবং সুযোগ সুবিধার হদিশ পৌঁছে দেওয়ার জন্যই কৃষি প্রগতি পত্রিকা। প্রতি ৩ মাস অন্তর আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে পত্রিকাটি। আপনাদের মূল্যবান মন্তব্য, লেখা, ছবি বা প্রশ্ন পাঠাতে চাইলে যোগাযোগ করুন নিচের ঠিকানাতে। পত্রিকাটির গ্রাহক হতে চাইলেও যোগাযোগ করুন।

ডিআরসিএসসি (কৃষি প্রগতি)
৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর,
কলকাতা - ৭০০ ০৪২
ফোন নং - ০৩৩ ২৪৪২৭৩১১
ই- মেল - kpragati08@gmail.com

সম্পাদকমণ্ডলী : সুব্রত কুন্ডু, তাপস মণ্ডল, মিন্টু মল্লিক

হরফ ও রূপ : অভিজিত দাস, শিপ্রা দাস

কলসি সেচ

ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের শুকনো এবংপ্রায় শুকনো অঞ্চলে চাষের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জল পাওয়া যায় না। কারণ এইসব অঞ্চলে অসম বৃষ্টিপাতের দরুন বছরের মধ্যে তিন চার মাস বৃষ্টিহয় না বা খুবই কম হয় । মাটির জলধারণ ক্ষমতা কম হওয়ার জন্য যে পাঁচ ছ-মাস ভারি বৃষ্টিহয়, সেই সময় বৃষ্টির জল মাটির গভীরে প্রবেশ করতে পারে না । অন্য দিকে ভারি বৃষ্টিতে উপরিস্তরের উর্বর মাটি ধুয়ে বেরিয়ে যায়। মাটির ওপর আচ্ছাদন না থাকার ফলে সারা বছর বাষ্পীভবন হতে থাকে ফলে সামগ্রিক একটা শুষ্ক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সেইজন্য এইসব অঞ্চলে একবিন্দু জলকেও উপযুক্ত ও সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন । তাই এইসব এলাকায় ফসল চাষে এবং নার্সারি তৈরির জন্য কলসি সেচ খুবই কার্যকরী । মাঠের মধ্যে পাইপ লাইন করে বিন্দুসেচ ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং গরিব মানুষের সাধ্যের বাইরে । কিন্তু কম খরচে খরা এলাকায় সেচের জন্য কলসি সেচের জুড়ি নেই । তাই এই সেচকে অনেক সময় 'গরিব মানুষের বিন্দুসেচ ব্যবস্থা' বলা হয় ।

কি কি লাগবে

একটা মাটির কলসি ।

যদি কুমোরকে বলে কলসি বানিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে, তবে নীচে লেখা নিয়মগুলি মেনে কলসিটি বানালে ভালো হয় ।

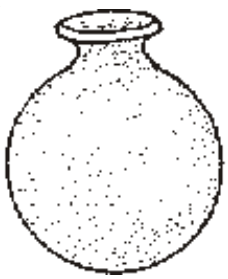

৪ভাগ মাটি ১ভাগ বালি

১) ৪ ভাগ মাটি ও ১ ভাগ বালি মিশিয়ে কলসিটি তৈরি করতে হবে । কলসির গা চকচকে করার জন্য আলাদা করে কোনও মাটির প্রলেপ দেয় না দেওয়া হয় । এর উদ্দেশ্য কলসির গায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছিদ্রগুলি বন্ধ না করা । এর ফলে কলসির ভেতরে সঞ্চিত জল জলকণার আকারে বাইরে আসতে পারবে এবং কলসির গা সবসময় ঘেমে থাকবে।

২) কলসির পেটের বেড় হবে ১৬-১৮ ইঞ্চি । দেখতে হবে যাতে অন্তত ৮-১০ লিটার জল ধরে ।

৩) কুমোর যদি বালি-মাটি মিশ্রণের অনুপাত বদলাতে রাজি না হন, সেক্ষেত্রে তাঁকে অনুরোধ করতে হবে তিনি যেন তাঁর মতোই কলসি তৈরি করেন, শুধু মাটির প্রলেপটা দেয় না দেন এবং পোড়ানোর আগে কাঁচা অবস্থায় কলসির তলার থেকে মোটামুটি ৩ থেকে ৪ ইঞ্চি ওপরে ২-৩টি ফুটো করে দেন ।
যদি কুমোরের বাড়ি যাওয়ার সুযোগ না থাকে, বাজার থেকে কলসি কিনেও এই ধরণের সেচ ব্যবস্থা চালু করা যায়।

সেক্ষেত্রে

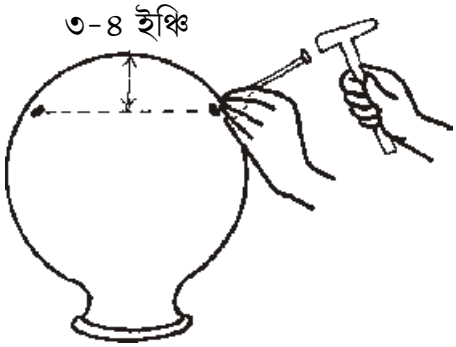

১) ৮-১০ লিটার জল ধরে এমন কলসি কিনতে হবে ।

২) কলসির তলার থেকে মোটামুটি ৩-৪ ইঞ্চি ওপরে কলসির গায়ে খুব সাবধানে ২-৩ ফুটো করতে হবে। ঠুকঠুক করে ঠুকতে হবে। জোরে ঠুকলে কলসিটাই ভেঙে যেতে পারে।

পদ্ধতি

- মাটিতে দেড় হাত গভীর দেড় হাত চওড়া একটা গর্ত করতে হবে যাতে কলসি বসালে চারপাশে ২ ইঞ্চি মতো জায়গা থাকে।

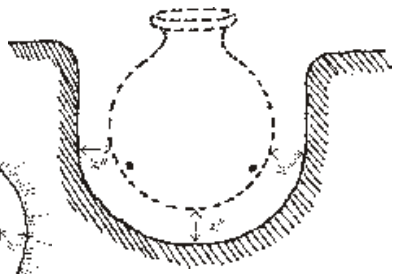

- কলসি গর্তে বসানোর আগে গর্তের ভেতরে কিছুটা কম্পোস্ট মিশ্রিত কাঁকুরে মাটি দিতে হবে যাতে গর্তে বসানোর পর কলসির উচ্চতার ৫ ভাগের ৪ ভাগ মাটির নীচে আর ১ ভাগ মাটির ওপরে থাকে। কম্পোস্ট মিশ্রিত কাঁকুরে মাটি দেওয়ার কারণ গাছের কিছুটা খাদ্য কলসির ফুটো দিয়ে বেরোনো জলের সঙ্গে মিশে শেকড়ের কাছে যাবে ফলে চারাগুলো জল ও খাদ্য দুটোই পাবে এবং তাড়াতাড়ি বাড়বে।

- জল কতটা ব্যবহার হয়েছে বোঝার জন্য কলসির মধ্যে ফুটোর একটু ওপর পর্যন্ত কয়েকটি ছোট নুড়ি পাথর রেখে দেওয়া যেতে পারে। জল নুড়ি পাথরের একটু ওপর পর্যন্ত নেমে গেলেই আবার জল ভর্তি করে দিতে হবে। কলসি কখনোই শুকিয়ে যেতে দেওয়া চলবে না। নুড়ি পাথরগুলো ছাঁকনিরও কাজ করবে। জলে মিশ্রিত পলি পাথরগুলোতেই আটকে যাবে, ফলে কলসির গায়ের ফুটোগুলো বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কমবে। এক্ষেত্রে মাঝে মাঝে পাথরগুলোকে কলসির থেকে বার করে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

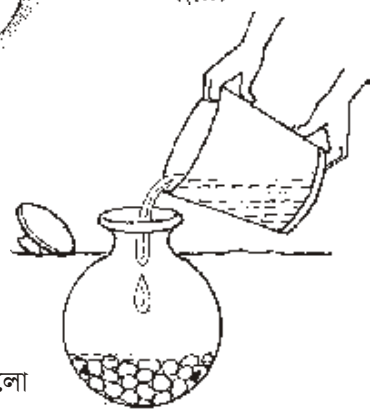

- ফুটো কলসির ক্ষেত্রে একটা মিহি কাপড় গর্তের মধ্যে রেখে তার ওপরে কলসিটা রাখলে ভালো হয়। এর ফলে কলসির গায়ের ফুটো দিয়ে জল বেরিয়ে মিহি কাপড়ের মধ্যে দিয়ে বাইরের মাটির সংস্পর্শে আসবে, কিংবা কাপড়টা ঢাকার জন্যা বাইরের মাটি কলসির গায়ের ফুটোগুলো বন্ধ করতে পারবে না। চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরোবে বলে জলও কম খরচ হবে। এরপর শুকনো পাতা এবং কম্পোস্ট মিশ্রিত কাঁকুরে মাটি দিয়ে কলসির চারপাশে গর্তের মধ্যে ফাঁকা জায়গাটা ভরে দিতে হবে।

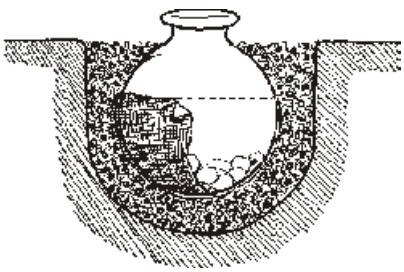

- এবার কলসিতে জল ঢালতে হবে এবং কলসির মুখ ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়ে রাখতে হবে যাতে জল বাষ্প হয়ে উবে যেতে না পারে এবং মশারাও যাতে জলে ডিম পাড়তে না পারে।
- ১-২ দিনের মধ্যে কলসির চারদিকের মাটি একটু ভিজিয়ে নিয়ে বীজগুলো বসাতে হবে। অঙ্কুরোদ্গম না হওয়া পর্যন্ত একটু একটু জল দিতে হবে।
- কলসির চারপাশ এবং চারাগুলোর গোড়ায় শুকনো খড়-পাতা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে, যাতে বাষ্পীভবন কম হয়।
- কলসির জলের ৫ ভাগের ৩ ভাগ জল যখন ব্যবহার হয়ে যাবে তখন আবার কলসিটাতে জল ভরে দিতে হবে।

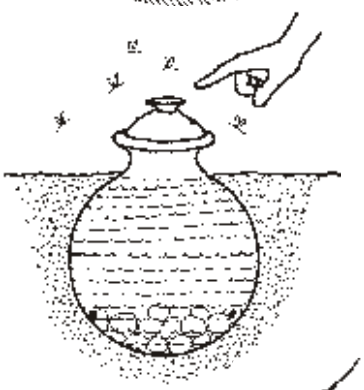

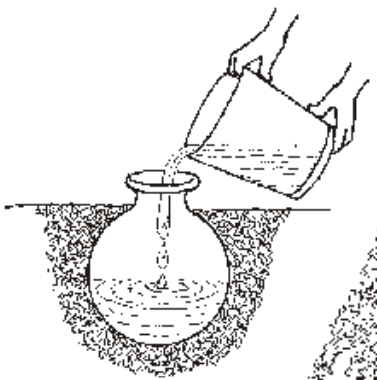

কলসি সেচের সুবিধা

- জল ও সারের সর্বাপেক্ষা কম ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করে।
- এই সেচ পদ্ধতিতে বিদ্যুত শক্তি বা অন্য কোনও প্রকার শক্তি ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। একবার জল কলসিতে ভর্তি করে দিলে এটা দিনের ২৪ ঘণ্টাই সেচের কাজ করে।
- কলসির চারপাশের ছড়ানো কম্পোস্ট ফুটো দিয়ে বেরোনো জলের সঙ্গে মিশে চারাগাছগুলোকে জল ও খাদ্য দুই-ই জোগায় ও গাছের তাড়াতাড়ি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এর ফলে অন্য সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কমে যায়।
- জলের সাশ্রয় হয়, কারণ মাটির তলায় জল নিঃসৃত হয় ও বাষ্পীভবনের হার কমে।
- ওপর থেকে সেচ দিলে বাষ্পীভবনের ফলে জল উবে যায় এবং ক্যাপিলারি প্রক্রিয়ায় মাটির নীচের লবণ ওপরে উঠে এসে জমে যায়। কলসি সেচের ক্ষেত্রে যেহেতু বাষ্পীভবন খুবই কম হয়, সেহেতু মাটির ওপরে লবণ জমে যাওয়ার সম্ভাবনাও কম।
- রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কম।
- যেসব আগাছা মাটির উপরিতলের জল ও খাদ্যের জন্য প্রতিযোগিতা করে, তাদের সহজে বাড়তে দেয় না। মাটির অন্তত ৬-৮ ইঞ্চি গভীরে না গেলে যেহেতু কলসির থেকে বেরোনো জলের নাগাল তারা পায় না, সেহেতু তারা বাঁচে না।

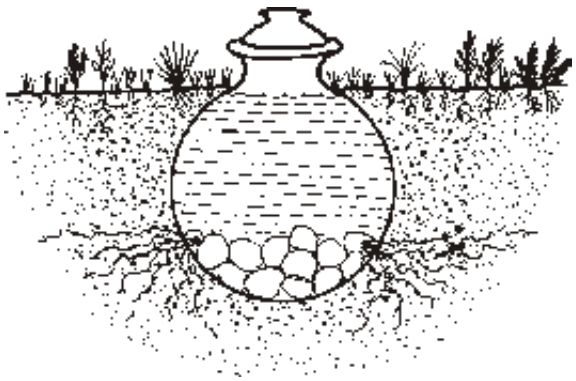

সামাজিক সুফল

- কুমোরদের কলসি তৈরির কাজদিয়ে গ্রামে কুটির শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়।
- স্থানীয় জিনিসের ব্যবহার বাড়ানো যায়।
- কলসিগুলোতে ক্রমাগত জল ভর্তির কাজের জন্য গ্রামে ভূমিহীন চাষিদের কাজে লাগিয়ে আরও কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।
- পরিবারের সকল সদস্য/সদস্যাই সহজে ব্যবহার করতে পারে।
- ভূগর্ভের গভীর স্তরের জল তুললে লবণাক্ততা বা আর্সেনিকের সমস্যা দেখা দিতে পারে। কলসি সেচে এই ধরনের পরিবেশগত সমস্যা হয় না।

যে যে বিষয়ে সতর্কতা নেওয়া প্রয়োজন

- কলসির চারধারে যে মাটি দেওয়া হবে তা যেন কম্পোস্ট মিশ্রিত কাঁকুরে মাটি হয়। এতে প্রয়োজনমতো কলসিটা উঠিয়ে ফুটোগুলো পরিষ্কার করে নেওয়া সহজ হয়। ঘামা কলসির ক্ষেত্রে কিছুদিন পরপর কলসির ভেতরের দিকের দেওয়ালটা শিরিষ কাগজ (বালি কাগজ) দিয়ে ভালো করে ঘষে পরিষ্কার করে দেওয়া যেতে পারে।
- যদি মাটিতে লবণের ভাগ বেশি থাকে তাহলে প্রতি তিন বছর অন্তর কলসি পাল্টাতে হবে যাতে পদ্ধতিটির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- বীজ এবং চারাগাছের দূরত্ব কলসির দেওয়াল থেকে ৬ ইঞ্চির মধ্যে হওয়া উচিত।
- শুষ্ক বা প্রায় শুষ্ক অঞ্চলে সমতলের বাগানগুলিতে একটি

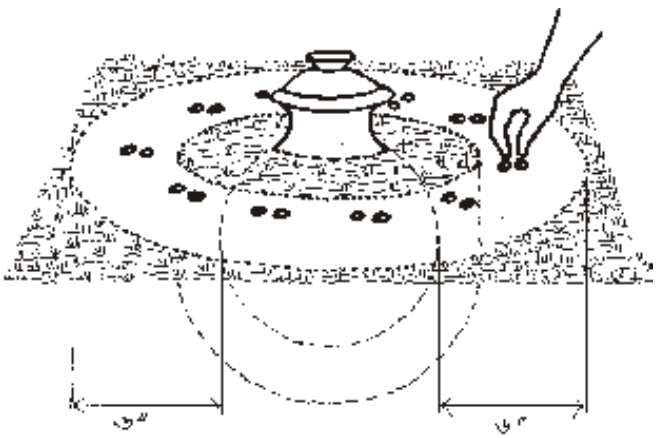

১০ হাত লম্বা ১০ হাত চওড়া মাদাকে সমান ৪ ভাগে ভাগ করে এক-একটি ভাগের মাঝখানে ১টি করে কলসি বসিয়ে তাকে ঘিরে সবজি চাষ করা যেতে পারে।

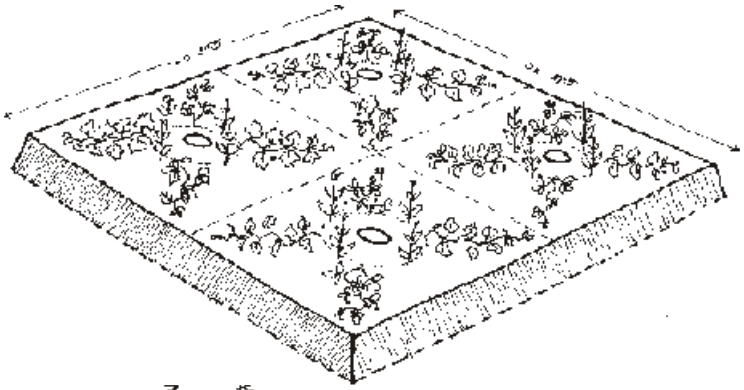

- চাষের জমিতে ১০ ফুট লম্বা এবংসাড়ে চার থেকে পাঁচ ফুট চওড়া মাদাকে সমান ৩ ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগে ১টি করে কলসি বসিয়ে সবজি চাষ করা যেতে পারে।

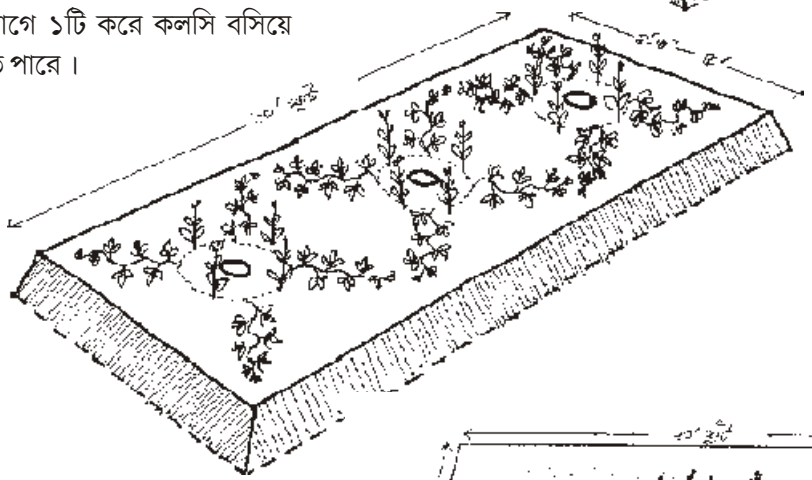

- ছোট বাগানে লাউ, কুমড়ো, শশা জাতীয় ছড়িয়ে বা লতিয়ে যাওয়া সবজিচাষের জন্য ২০ ফুট লম্বা ২০ ফুট চওড়া জায়গার মাঝখানে একটি সার্কেল গার্ডেন করে তার মাঝে একটি বড় কলসি বসিয়ে দিলে তা ওই পরিমাণ জায়গা সেচের পক্ষে যথেষ্ট। এই ধরনের লতার শুধু শিকড়গুলি কলসির কাছে থাকলেই পুরো জায়গাটায় লতাগুলি ছড়িয়ে পড়ে।

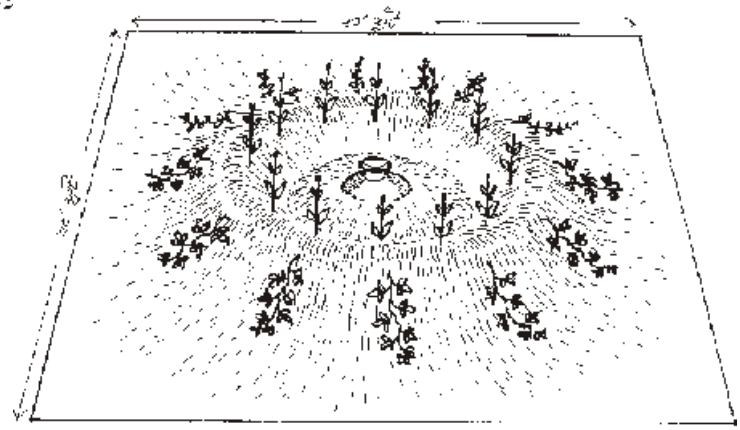

সফল নজির

- কর্ণাটকের প্রায় শুষ্ক অঞ্চল এবং অসমতল বা উঁচু নীচু জমিতে কলসি সেচ একটি জনপ্রিয় ও প্রচলিত পদ্ধতি।
- পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়া জেলা সাধারণত শুষ্ক এলাকা হিসেবে পরিচিত। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। ফলে ফসল চাষের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জলের সরবরাহ থাকে না। এইসব শুষ্ক অঞ্চলে কলসি সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করে চাষের জলের অভাব কিছুটা মেটানো যায়। এখানকার কয়েকটি গ্রামে চাষিরা কলসি সেচকে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করে জলের অভাব কিছুটা মেটাতে সফল হয়েছেন।

সূত্র : Resource Management in rainfeed drylands, Myrada and IIRR, 1997
Environmentally sound technology for women in agriculture, ISWA and IIRR, 1996
সুস্থায়ি কৃষি নেটওয়ার্কের সহযোগী সংগঠন ও চাষিদল থেকে প্রাপ্ত তথ্য

খাদ্য ও কাজের নিরাপত্তার উদ্যোগ- ধাপ পুকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন

বিষয়

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে, ছোটনাগপুর মালভূমির আওতায় থাকা জমি বেশ অসমতল। উঁচু জমির বেশিরভাগটাই ন্যাড়া। পাথুরে লালমাটি, জল ধারণ ক্ষমতা কম। বছরের ১২০-১৪০ সেন্টিমিটার বৃষ্টির বেশিরভাগটাই হয়ে যায় বর্ষার ২ মাসে। বাকি সময়টা শুকনো। গরমের সময়ে প্রতি বছরই খরার মতো অবস্থা। এখানে সাধারণত বর্ষার জলে একবারই চাষ হয়। জলবায়ু বদলের ফলে এবার মার খাচ্ছে বর্ষার ফসলও। বেশিরভাগ সময় জমি খালি পড়ে থাকে বলে প্রচুর ভূমিক্ষয় হয়। এই পরিস্থিতিতে খাদ্যের অভাবে বেশিরভাগ মানুষ এলাকা ছেড়ে চলে যায় কাজের সন্ধানে। জমির নিচে পাথর থাকার কারণে এখানে পুকুর খুঁড়তে অনেক অর্থ দরকার। বেশিরভাগ পুকুরই তাই অগভীর, গরমের সময় জল থাকে না। কুঁয়োগুলিও শুকিয়ে যায়। কয়েকটি নদী ও ঝোরাতে সারা বছর জল থাকলেও শুখার সময় চাষের কাজে তার ব্যবহার হয় না।

প্রস্তাব

- এখানকার গরিব চাষিদের দল গঠনে উৎসাহ দিয়ে, ওই দলের মাধ্যমে নতুন পুকুর খনন ও পুরনো পুকুরের সংস্কার করা যায়।
- এই পুকুরের চারদিকে ৩-৪টি বড় ধাপ করা যায়। বর্ষার সময়ে এই ধাপগুলি জলে ডুবে থাকে। শুখার সময় জল নামতে থাকলে এই ধাপগুলিতে নানা ধরনের সবজি চাষ করা যায়।
- বর্ষার জল সরাসরি পুকুরে পড়ার পাশাপাশি আশেপাশের জমির জল পুকুরে আনার জন্য ছোট নালা কাটা যায়।
- পুকুরের চারদিকের ধার বরাবর মাচা করলে তাতে লতানে সবজিচাষ করা যায়। পুকুরের পাড় চওড়া হলে সেখানেও সবজি, ডাল চাষ করা সম্ভব। এখানে বহু ব্যবহার রয়েছে এরকম গাছের চাষও করা যায়।
- অতিরিক্ত আয়ের জন্য পুকুরে মাছেরও চাষ করা সম্ভব।
- পুকুরের জল দিয়ে আশেপাশের জমিতে নানা রকমের ফসল চাষ করা যায়।
- পুকুরকে ঘিরে তৈরি হওয়া জীববৈচিত্র রক্ষার জন্য আমরা এখানে জৈব চাষের কথা বলি।
- পুকুর ঘিরে সমগ্র উৎপাদন দলের সব সদস্যদের মধ্যে সমান ভাগে বন্টন হওয়া জরুরি।

কার্যক্রম

বিভিন্ন দলের উদ্যোগে ও আমাদের সহায়তায় এখনো অবধি এরকম ১৯টি পুকুর তৈরি হয়েছে পুরুলিয়াতে। ১.৩ একর জমিতে এরকমই একটি পুকুর তৈরি হয়েছে শালডিহার। দলের সদস্যরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জমির মালিকের থেকে ৩০ বছরের জন্য লিজনেয়। ঠিক হয় ৩০ বছরের পরেও, বিনে পয়সায়, আশেপাশের পড়ে থাকা জমি চাষ করা যাবে। এই জমিতে দলের সদস্যরা ১৮০ফুট X ১৬০ ফুট X ১০ ফুট মাপের একটি পুকুর খোঁড়ে। একাজে ১০০ ঘনফুট মাটি কাটার জন্য ডিআরসিএসসি ৫০ টাকার ধান দেয় এবং সদস্যরা তাদের শ্রম দেয় - যার মূল্য ১৮ টাকা (বর্তমানে ১০০ দিনের কাজে অদক্ষ শ্রমিক পায় ১৩০ টাকা। এখন আমরা ধান দিই ৯৭টাকা ৫০ পয়সার। আর দলের সদস্যরা ৩২টাকা ৫০ পয়সার শ্রম দান করে)। শালডিহার পুকুরের পাড়ে চাষ হয় সবজিও ডালের। এছাড়া বহুমুখী গাছও লাগানো হয়েছে। মাচায় চাষ করা হয় কুমড়ো, লাউ, উচ্ছে, ঝিঙে। শুখার সময় জো থাকা ধাপে শাক ও সবজির চাষ করা হয়। পুকুরের জল দিয়ে আশেপাশের প্রায় ১৭ একর জমিতে চাষ করা হয়। প্রথমে পরিকল্পনা ছিল ১০ একর জমিতে চাষ করা হবে। কারণ পুকুরে বেশি দিন জল থাকবে না। পরে দলের সদ্যরা মিলে পুকুরটি আরো গভীর করে। পুকুরকে ঘিরে তৈরি হওয়া উৎপাদন ব্যবস্থার সব উৎপাদন সমান ভাগে দলের সদস্যদের মধ্যে বন্টন হয়। তবে কিছু কিছু গ্রামবাসীদের মধ্যেও বিলি করা হয়। বাজারে বিক্রি করা সামগ্রীর অর্থ দলের তহবিলে জমা হয়। এ দলটি মাছ চাষ করে দেখতে গিয়ে মার খায়। কারণ সেচের জল সরবরাহ করার পর পুকুরে মাছ চাষের মত জল ছিল না।

ছবি : ফিল্ডটিম, ড্রাই

প্রতিফল

- পড়ে থাকা জমিতেও খাদ্য, জ্বালনি, পশুখাদ্য উৎপাদন সম্ভব।
- এভাবে কাজের দিন বাড়ে। ফলে কাজের জন্য অন্যত্র যাওয়া কমতে পারে।
- জমির উর্বরতা বাড়ে।

  প্রায় সারা বছর ধরে পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যায়।
- অতিরিক্ত ফসল বেচে হাতে টাকা আসে।
- এভাবে পুকুর খুঁড়ে ফসল ফলানো ও কাজ সৃষ্টিতে স্থানীয় পঞ্চায়েতের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে।

সম্ভাবনা

পুকুর কাটার শ্রমের জন্য কিছুটা অর্থ বিনিয়োগ দরকার। ডিআরসিএসসির সহায়তায় মডেল তৈরি হয়েছে। এবারে তা ছড়ানোর জন্য সরকারের উদ্যোগ নেওয়ার পালা।

প্রাথমিকভাবে দলের সদস্যদের উৎসাহিত করা বেশ কঠিন। কিন্তু প্রথমবার ফসল পাওয়ার পর আর ফিরে তাকানোর অবসর থাকে না দলের সদস্যদের। এভাবেই গড়ে ওঠে জন উদ্যোগে পতিত জমিতে চাষ ও জল ধারণের সুস্থায়ী ব্যবস্থা।

কলসিসেচ -একটি ইতিবৃত্ত

যেখানে জল নেই বা জলের আকাল রয়েছে এমন জায়গায় সহজেই সেচ দেওয়ার জন্য কলসি সেচ খুবই ভাল পদ্ধতি। কম পরিশ্রমে, অল্প জলে টাটকা সবজি উৎপাদন করতে কলসি সেচের জুড়ি মেলা ভার। আর এইভাবেই সেচ দিয়ে ফসল উৎপাদনে সফল হয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলার বাসন্তী মুর্মু। তিনি নবগ্রাম ব্লকের ভোলাডাঙা গ্রামের বাসিন্দা আর হরিয়ত ধরতি মহিলা দলের সদস্যা।

এই কাজের প্রেক্ষাপট

বাসন্তী মুর্মুর জমি বলতে আড়াই কাঠার উপর ছোট্ট একটা বাড়ি আর সামনে এক চিলতে উঠোন সেখানেই তিনি করেছিলেন সবজি বাগান। সবজির বীজ বা চারা লাগিয়ে অল্প জল দিয়ে গাছগুলি বেড়ে উঠেছিল ভালোই। কিন্তু গাছের বৃদ্ধির সময় যখন প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়,তখন বাসন্তীর পক্ষে ২ কিমি হেঁটে জল জোগাড় করে গাছে সেচ দেওয়া বেশ মুগকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামে জলের অভাবে একমাত্র বর্ষার সময় ছাড়া তাঁর দলের সদস্যরা সবজি বাগানের কথা ভাবতেই পারেন না। গাছগুলি ফল ফুল ধারার আগেই শুকিয়ে যায়। তিনি এই সমস্যার সমাধান খুঁজছিলেন। এরপর ডিআরসিএসসি'র প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জানতে পারেন শুষ্ক জায়গায় কিভাবে কলসির সাহায্যে সহজেই জলসেচ করা যায়।

কলসি সেচ

বাসন্তী মুর্মুর বাড়ির সামনের উঠোনে সবজি লাগানোর জন্য ১০ ফুট x ৪ ফুটের ২টি বেড ছিল। প্রথমেই তিনি ওই বেডগুলিকে কুঁপিয়ে কম্পোস্ট ও পাতা পচা সার মিশিয়ে গাছের উপযোগী করে তোলেন। এরপর ১০ লিটার জল ধরে এমন চারটি মাটির কলসি কেনেন। কলসির তলার দিকে ৩-৪ ইঞ্চি ছেড়ে উপরের দিকে কলসির গায়ে ২ইঞ্চি পেরেকের সাহায্যে তিনি ২-৩টি ফুটো করেন। পরে বেডে সমান দূরত্বে মাটিতে দেড় হাত গভীর ও দেড় হাত চওড়া গর্ত করেন। কলসি বসানোর আগে ওই গর্তে কিছুটা পুরানো গোবর ও পাতা পচা সার ও বালি মাটি মিশিয়ে ছড়িয়ে দেন এবং কলসিগুলিকে গর্তে বসান। কলসিগুলির ৪ ভাগ মাটির নীচে ও ১ ভাগ অর্থাৎ গলা পর্যন্ত মাটির উপরে রাখেন। জল কতটা ব্যবহার হয়েছে বোঝার জন্য কলসির মধ্যে ফুটোর একটু উপর পর্যন্ত ছোট নুড়ি পাথর দিয়ে ভরে দেন। কলসিতে জল ভরার পর কলসির মুখে নারকেলের মালা দিয়ে ঢেকে দেন। এরপর কলসির চারপাশে সবজির চারা ও বীজ লাগান। তাঁকে প্রতি ৫ দিন অন্তর কলসিতে জল ভরতে হয়।

কলসি সেচে কি কি সুবিধা হয়েছে

আগে প্রতি একদিন অন্তর বাগানে জল দিতে হত অর্থাৎ ১০ x ৪ ফুটের দুটি বেডে একদিন অন্তর জলের চাহিদা ছিল ২০ লিটার। এখন কলসি সেচের মাধ্যমে প্রতি ৩ দিন অন্তর কলসিতে ৫ লিটার করে জল ভরতে হয়, অর্থাৎ ৩ দিন অন্তর ২০ লিটার জল দিতে হয়। (প্রতি ৩ দিন অন্তর কলসির অর্ধেক জল খালি হয়ে গেলে পুনরায় ভর্তি করে দেওয়া হয়) কলসি সেচ করার ফলে আগের মত জলের অভাবে গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে না এবং তাঁর বাগানে বিভিন্নরকম টাটকা শীতের সবজি রয়েছে।

জলের চাহিদার তুলনা

আগে মাসিক জলের চাহিদা	কলসি সেচের জলের চাহিদা	তিনমাসে উৎপাদন হয়েছে
২০ লিটার X ১৫ দিন (১ দিন অন্তর) = ৩০০ লিটার	৪টি কলসিতে মোট ২০ লিটার x ১০ দিন (৩ দিন অন্তর) = ২০০ লিটার	৪৭ কেজি সবজি (বেগুন,লঙ্কা,পালং নটে,বিনস,সিম ইত্যাদি)

দলের সদস্যদের প্রতিক্রিয়া

বাসন্তী মুর্মুর দেখাদেখি তাঁরই দলের অন্য ২ জন সদস্য বালিকা মার্ডি ও মিনতি হেমব্রম তাঁদের বাগানে কলসি সেচের মাধ্যমে জলসেচ দেওয়া শুরু করেন।

বাসন্তী মুর্মুর মন্তব্য

কলসি সেচের ব্যবহারে দুটি বেড থেকে মোট ৪৭ কেজি বিভিন্ন রকমের সবজি (বেগুন, লঙ্কা, লাউ, শাক ইত্যাদি) পেয়েছি যার মধ্যে ১৫ কেজি সবজি গড়ে ১০ টাকা করে বিক্রি করায় ১৫০ টাকা আয়ও হয়েছে। জলের অভাবে পিছিয়ে না এসে কলসির মাধ্যমে বাগানে সেচ দিয়ে আমি লাভবান হয়েছি।

ছবি : পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী

তথ্য : পার্থ প্রতিম চক্রবর্তী,
স্টেপআপ প্রজেক্ট, ডিআরসিএসসি, মুর্শিদাবাদ
অনুলিপি : মিন্টু মল্লিক, ডিআরসিএসসি

শিমূল আলু (কাসাভা)

পরিচয়

কাণ্ড কাষ্ঠল, অমসৃণ। পাতা গাঢ় সবুজ, পাঁচ থেকে সাতটি কোনযুক্ত। গাছের গোড়া থেকে একসাথে অনেকগুলি, লম্বা কন্দমূল বের হয়। খোসা লাল বা বাদামি, মাঝের অংশ সাদা। ফুল হলদেটে বা সবুজাভ সাদা। ফল গোলাকার, রোমহীন ও মসৃণ। প্রতিটি ফলে তিনটি করে বীজ থাকে। ফল পেকে গেলে সশব্দে ফাটে ও বীজগুলি ছড়িয়ে পড়ে। এই বীজ থেকে গাছ হয় না।

চাহিদা ও সহ্যক্ষমতা

দোঁয়াশ বা বেলেমাটিতে এর চাষ ভাল হয়। তবে জলনিকাশি ব্যবস্থাযুক্ত যে কোন উর্বর মাটিতেই এর চাষ করা যায়। অল্প আম্লিক মাটি এর চাষের পক্ষে উপযুক্ত। খরা সহ্য করতে পারে, তবে জলজমা সহ্য করতে পারেনা। সারাদিন রোদ পায় এমন জায়গায় লাগানো উচিত। জলের চাহিদা কম, আলোর চাহিদা বেশি।

চাষ পদ্ধতি

বর্ষা বাদ দিলে বছরের যে কোন সময় লাগানো যেতে পারে। ডালের টুকরো বা কাটিং থেকে হয়। ২৫-৩০ সেন্টিমিটার লম্বা, শক্ত ডালের টুকরো (কাটিং), তেরছা করে এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে ২৵৩ অংশ মাটির উপরে থাকে। শুকনো এলাকায় ৩-৬ সেন্টিমিটার গভীরে গোটা ডালের টুকরোটি মাটির সমান্তরালে লাগাতে হবে। কন্দ তৈরি হতে ৯-১০ মাস সময় লাগে। শাক সারাবছর পাওয়া যায়। সবজি বাগানের বেড়াতেও লাগানো যেতে পারে, শুকনো এলাকার মাঠের ফসল হিসেবেও চাষ করা সম্ভব। শুঁটি জাতীয় ফসলের সঙ্গেও লাগানো যেতে পারে।

রোগ

এই গাছে রোগপোকা বিশেষ হয়না। তবে ইঁদুরে অনেকসময় শিকড় খেয়ে ফেলে।

ব্যবহার

পাতা ও মুল দুই'ই খাওয়া যায়। শিকড়ের শর্করা ও খনিজ থাকলেও ভিটামিন নেই। পাতা খাওয়ার আগে সেদ্ধ করে জল ফেলে দিতে হবে। মূল সেদ্ধ করে অথবা পুড়িয়ে ছাল ছাড়িয়ে খাওয়া যায়। মূল আধসেদ্ধ করে শুকিয়ে যে গুঁড়ো তৈরি হয় তা আটার মতো ব্যবহৃত হয়। বেশিদিন রাখতে হলে সেদ্ধ করে শুকিয়ে, গুঁড়ো বা দানা হিসেবে রাখতে হয়। দক্ষিণ ভারতের কেরালায় বহুল প্রচলিত।

বিশেষ সতর্কতা :

কাসাভার মূল ও পাতায় বিষক্রিয়া করতে পারে এমন কিছু পদার্থ থাকে। বিশেষত যদি মূলের ছাল ও শাঁসের রঙ লালচে হয়। সাদা মূলের কাসাভা খাওয়াই ভাল। কাসাভার মূল মাটি থেকে তুলে নেওয়ার ১ -২ দিনের মধ্যেই খেয়ে নেওয়া উচিত।

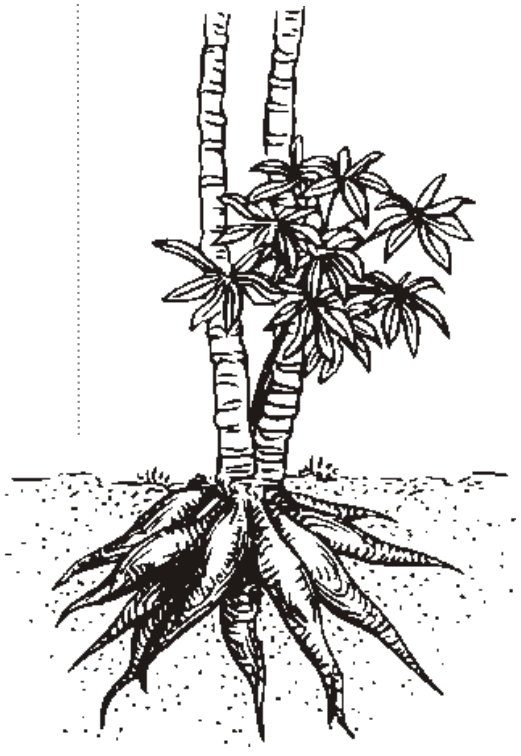

চাষিদের জন্য সুযোগ সুবিধা

ছোট পশু ছাগল, ভেড়া ও খরগোশ পালনে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত সুসংহত উন্নয়ন প্রকল্প (Integrated Development of small ruminants and rabbits)

পটভূমি :

গ্রামাঞ্চলের গরিব পরিবারগুলি ভেড়া ও ছাগল পালন করে এবং এই পেশা ভূমিহীন কৃষক, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের জীবিকা নির্বাহে সহায়ক।

বৈজ্ঞানিক প্রজনন ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ে এই ক্ষেত্রটি পিছিয়ে থাকায়, পশুদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়নি। নিবিড়ভাবে ছাগল, ভেড়া ও খরগোশের উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মে নিযুক্তি ও গ্রামীণ সমৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা আছে।

কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত প্রকল্পের ২৪টি রাজ্যের ১১৪ টি জেলায় ছাগল, ভেড়া এবং ১২টি জেলায় খরগোশের উন্নয়নের জন্য মূলধন অনুদান সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ৭টি জেলা (বাঁকুড়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পুরুলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ছাগল ও ভেড়া পালনের জন্য ও দার্জিলিং খরগোশ পালনের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভেড়া/ ছাগল/ খরগোশ
  পালনে উৎসাহিত করা,
- বাছাই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রচলিত জাতর মান উন্নয়ন করা
- বিপণনে সহায়তা করা

প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্য সমূহ

এই প্রকল্পে সহায়তা দেওয়া হয় ঋণের মাধ্যমে। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ভরতুকি বা সাবসিডির টাকা পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট ফর্ম অনুযায়ী ব্যাঙ্কে আবেদন করলে ব্যাঙ্ক কর্তৃক আবেদনকারীর খামার পরিদর্শনের পর অনুমোদন দিলে তবেই আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে।

যোগ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ

- বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমূহ
- আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সমূহ
- রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহ
- রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ বিকাশ/গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক সমূহ
- নাবার্ডের পুনর্বিত্ত সহায়তা (Back ended subsidy) পাওয়ার যোগ্য প্রতিষ্ঠান সমূহ।

প্রকল্পটিতে ২টি অংশ আছে

প্রাণী প্রতিপালন - যার যোগ্য সুবিধা প্রাপকরা হচ্ছেন স্বতন্ত্র কৃষক, স্বনির্ভর গোষ্ঠী সমূহ, যুগ্ম ঋণ দায় গোষ্ঠী ইত্যাদি

- প্রজনন খামার/ফার্ম যেখানে সুবিধা প্রাপকরা হচ্ছেন স্বতন্ত্র কৃষক, অসরকারি সংস্থা, কোম্পানি সমূহ

ঋণ প্রদানের ধরন

অনুদান সহায়তা : সাধারণ উদ্যোগীদের ক্ষেত্রে প্রকল্প খরচের ২৫ শতাংশ ও তপশিলি জাতি ও উপজাতি উদ্যোগীদের ক্ষেত্রে ৩৩,৩৩ শতাংশ। প্রান্তিক অর্থ বা মার্জিন মানি - প্রতিপালন ক্ষেত্রে প্রকল্প খরচের ১০ শতাংশ এবং প্রজননকারী সংস্থাকে কমপক্ষে ২৫ শতাংশ।

ব্যাঙ্কের ঋণ

সাধারণ উদ্যোগীদের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ মোট প্রকল্প খরচের ৫০ শতাংশের কম হবে না। তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৫৮ শতাংশের কম হবে না।

প্রকল্প অনুযায়ী খরচের পরিমাণ

ভেড়া ও ছাগল প্রতিপালনের ক্ষেত্রে (৪০+২টি = ১ লক্ষ টাকা পশুর ক্ষেত্রে

- ভেড়া ও ছাগল প্রজনন ক্ষেত্রে (৫০০+২৫টি = ২৫ লক্ষ টাকা পশুর ক্ষেত্রে)
- খরগোশের প্রতিপালনের ক্ষেত্রে ২.২৫ লক্ষ টাকা

অনুদানের উর্দ্ধসীমা

- ভেড়া ও ছাগল পালনের ক্ষেত্রে : ২৫,০০০ টাকা (সাধারণের জন্য)
  তপশিলি জাতি উপজাতির ক্ষেত্রে ৩৩,০০০ টাকা
- ভেড়া ও ছাগল প্রজননের ক্ষেত্রে : ৬,২৫ লক্ষ টাকা (সাধারণের জন্য)
  তপশিলি জাতি উপজাতির ক্ষেত্রে ৮,৩৩ লক্ষ টাকা
- খরগোশ পালনের ক্ষেত্রে= ৫৬,০০০ লক্ষ টাকা (সাধারণের জন্য)
  তপশিলি জাতি উপজাতির ক্ষেত্রে ৭৫,০০০ লক্ষ টাকা

অন্যান্য সুবিধা

- একটি রাজ্য স্তরের ঋণ অনুমোদন এবং তদারকি কমিটি (এসএলএসএনসি) গঠন করা হবে যার কমিটিতে থাকবেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের সচিব (রাজ্যের), লিড ব্যাঙ্ক, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর (ভারত সরকার) নাবার্ড এবং সুপরিচিত অসরকারি সংস্থা।
- অর্থ প্রদানকারী ব্যাঙ্কের মাধ্যমে মূলধন অনুদান সাহায্য দেওয়া হবে এবং ঋণের অংশ শোধ হওয়ার পরেই ওই টাকা ঋণ গ্রহীতার হিসাব খাতায় তোলা হয়ে থাকে।
- ঋণ ফেরতের জন্য সর্বাধিক ৯ বছর (২ বছর ছাড় ধরে) সময় পাওয়া যায়।
- ঋণের উপর সুদের হার ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলী এবং অর্থ বিনিয়োগকারী ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

তথ্য সরবরাহ : নাবার্ড লিফলেট
অনুলিখন : মিন্টু মল্লিক, ডিআরসিএসসি

চাষের উপকরণের হদিস

এই সংখ্যায় রয়েছে কেঁচোসার ও ভাল জাতের কেঁচো, নিমতেল ও নিমখোল, জীবাণুসার ইত্যাদির সন্ধান। এছাড়াও চাষি দল দ্বারা উৎপাদিত ঢেঁকিছাঁটা চাল ও খেজুর গুড়ের সন্ধান।

১। ভাল জাতের কেঁচো ও কেঁচো সারের যোগাযোগ :

• মা সারদা এসজিএসওয়াই গ্রুপ,
বেলবনি, বাঁকুড়া
যোগাযোগ। সুমিতা বাউড়ি
৮৩৮৯০৫৪১৫৭

•**গাঁদাফুল মহিলা সমিতি**
গ্রাম - উপরজল, বীরভূম
যোগাযোগ। চুরকি মান্ডি
৯৫৪৭০৪৪৯৩৮

• **গদাই হেমব্রম**
গ্রাম লক্ষ্মীপুর,পুরুলিয়া
যোগাযোগ। ৯৯৩৩৬৮৯৬৪
(কেঁচোসারের দর ৭ টাকা/কিলো ও প্রতিটি কেঁচো ১ টাকা)

•**দেবাশীষ দাস**
গ্রাম - মহেন্দ্রগঞ্জ, সাগরদ্বীপ,
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
যোগাযোগ। ৯৬৭৪৪৮১০২৪
(কেঁচোসারের দর ৮ টাকা/কিলো ও প্রতিটি কেঁচো ৫০ পয়সা)।

• **গৌড় গ্রামীণ ভার্মি কম্পোস্ট**
গ্রাম - বক্সীনগর, পোষ্ট - আইহো,
মালদা, পিন নং - ৭৩২১২১
যোগাযোগ। আনন্দ মৃধা
৯৯৩৩৬৪০৩৯৬
(কেঁচোসারের দর ৬ টাকা/কিলো ও প্রতিটি কেঁচো ১ টাকা)

২. নিম তেল ও নিম খোল

• **রাজবাঁধ মারাংবুরু মহিলা সমিতি,**
রাজবাঁধ, বাঁকুড়া
যোগাযোগ। অভিরাম হেমব্রম
৯৭৩১৮০৫৩২৭

• **নতুন ডিহি মার্শাল মাডোয়া**
পুরুষ দল
নতুনডিহি, পুরুলিয়া
যোগাযোগ। সুনীল মুর্মু
৯৭৭৫৫২৯৬৫২
(নিম তেল কিলো প্রতি ২৫০ টাকা ও নিম খোল কিলো প্রতি ৪০ টাকা)

৩. জীবাণুসার ও ছত্রাকনাশক

• **বীরভূম প্রজেক্ট, ডিআরসিএসসি**
তাঁতবাঁধী, বীরভূম
যোগাযোগ। সুশান্ত বাগদি
৭০২৯১৫৬২৬৬
(জীবাণুসার ও ছত্রাকনাশক ৩০০ গ্রামের প্যাকেট ৩৫ টাকা)

• **নিমপিঠ বায়োটেকনোলজি**
নিমপিঠ আশ্রম,
জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
যোগাযোগ। ০৩২১৮২২৬০০৩
(জীবাণুসার ও ছত্রাকনাশক ১০০ গ্রামের প্যাকেট ১৬ টাকা)

•**ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যান্ড ফাইটোকেমিক্যাল কর্পোরেশন**
এলকো হাউস, ১ নং বিটি,
মহারাজ সরণী, কলকাতা - ১
ফোন - ৮৫৪১৯৪৮৬৫৯

•**নাইট্রো ফিক্স ল্যাবরেটরিস**
২৫, বাঁশদ্রোনী অ্যাভিনিউ,
কলকাতা - ৭০০ ০৭০
যোগাযোগ। ০৩৩ ২৪৭১৮৪৮৬

৪. ঢেঁকি ছাঁটা চাল
পুরুলিয়া প্রজেক্ট, ডিআরসিএসসি
সুতলি বারি, পুরুলিয়া
যোগাযোগ। পবিত্র মাইতি
৯৭৩২৫৩৬৬৭২
(কবিরাজ শাল ও চন্দ্রকান্ত ইত্যাদি দেশি চালের দর কিলো প্রতি ৪৫ থেকে ৫০ টাকা)

৫. খেজুরের গুড়

• **আলিঝাড়া আখিলজাহার**
মার্শাল গ্রুপ
গ্রাম - জয়নগর, বাঁকুড়া
যোগাযোগ। ধনঞ্জয় হেমব্রম
৮৬৪১০৭০৮১৭

• **অকুর ঘোষ**
গ্রাম - সুরকাটা, বীরভূম
ফোন - ৮৬৪১০৭০৮১৭

• **বীর সাধু চাষি দল**
গ্রাম - বড় টাঁড়, পুরুলিয়া
যোগাযোগ - মহাদেব টুডু
৭৭৯৭৫৪৮৭৪০
(কিলো প্রতি ১০০ টাকা)

কমগম

ভারতে গমের ফলন কমছে। ২০১০ -এর ফলন ধরে বললে এই পরিমাণ অর্ধেক হয়েছে। এই নিয়ে সমীক্ষা করেছে ন্যাশনাল আকাদেমি অব সায়েন্স। এই জন্য নেওয়া হয়েছে ৩০ বছরের তথ্য। দেখা গেছে ৯০ শতাংশ গম নষ্টের কারণ ধোঁয়াশা ও দুষণ। ফলন কমের এই ঘটনা দেখা গেছে ঘন বসতির রাজ্যগুলোয়।

আলট্রাফানসো

মহারাষ্ট্রের পশ্চিমঘাট পাহাড়ের আলফানসো আমের জন্য নামডাক আছে। এই আমটার বাজারে বেশ চাহিদাও আছে। তাই এইখানে এই আমটাই বেশি করা হয়। এইদিকে এই আমটা বেশি করে করতে গিয়ে ওখানকার দেশী আমগুলো চাষ করা হচ্ছে না। ফলে দেশী আমগুলো উধাও হয়ে যাচ্ছে। অথচ পশ্চিমঘাটে দেশী জাতের আম প্রথম চাষ করা হয়।

ওখানে এখন ২০৫টি দেশী জাতের হদিশ পাওয়া গেছে। আরো জাতের হদিস পাওয়া যাবে। দেশী জাতগুলো গ্রামে ও নানা প্রতিষ্ঠানে অনেকগুলো করে লাগানোর ব্যবস্থা হয়েছে। এইভাবে হয়তো দেশী গাছকে কিছুটা বাঁচানো যাবে। এই কাজে স্কুলের ছেলেমেয়েরাও হাত লাগাচ্ছে। দেশী জাত বাঁচানোর এই উদ্যোগটা নিয়েছে মহারাষ্ট্রের পরিবেশ বিভাগ।

অমৃতস্বর

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী প্রকৃতি-নির্ভর চাষে উৎসাহ দেখিয়েছেন। পাঞ্জাবে এবার এই চাষ নিয়ে কার্যক্রমের এক রূপরেখা বানানো হবে। এইজন্য একটা খসড়া বানানো হচ্ছে। এই খসড়ায় এখন অব্দি মত দিয়েছেন জলসংরক্ষণ অগ্রণী রাজিন্দর কুমার, চাষি দিপক সুচদে, কৃষিবিজ্ঞানী ড.ওমপ্রকাশ রুপেলা, হু-এর বিশেষজ্ঞ হেমন্ত গোস্বামী ও কোয়ালিশন ফর জিএম ফ্রি ইন্ডিয়া-র আহ্বায়ক রাজেশ কৃষ্ণন।

নৈর্ঋত কিরণ

মেঘালয় সরকার বলছে তারা আর ওই রাজ্যে চাষবাসে কীটনাশক ব্যবহার করবে না। মেঘালয়ে চাষে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে প্রতিবছর লাখ লাখ মানুষ বিষে আক্রান্ত হচ্ছে। তাই ওখানে সরকার এইরকম ভাবছে। সঙ্গে সঙ্গে ওখানে মাটিকে ভালো করতে জৈবসার তৈরিরও উদ্যোগও নিচ্ছে তারা।

...সোহাগা !

এমনিতেই রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পরিবেশের দূষণ বাড়ছে। এর সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোঁড়া হল নকল ও ভেজাল কীটনাশকের সমস্যা। লোকসভায় লিখিতভাবে কৃষি রাজ্য-মন্ত্রী ড. সঞ্জীব বাল্যান একথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ২০১৩-১৪ বছরে ১৪৯৫ টি কীটনাশক নমুনা পাওয়া গেছে, যেগুলি নকল ও ভেজাল। কিন্তু এক্ষেত্রে কোম্পানিগুলিকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ চলতি আইন অতটা শক্তিশালী নয়। কিন্তু ২০০৮ সালের পেস্টিসাইড ম্যানেজমেন্টে বিল আইন হিসেবে বলবৎ হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু 'উন্নত' চাষের নামে প্রকৃতিতে রাসায়নিক কীটনাশকের মাধ্যমে যে বিষ ঢালা হচ্ছে তার থেকে রেহাই কীভাবে পাওয়া যাবে।

দেখো

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ওখানে বাজারের সব ফল-সবজি বিভাগীয় আধিকারিকদের ভালো করে পরীক্ষা করিয়ে নিতে বলেছেন। কেরলে ফল-সবজিতে খুব কীটনাশক চাষিরা মেশাচ্ছে। এক এক করে কেরলে অনেক ফল ও সবজিই পরীক্ষা করানো হচ্ছে। এখন অব্দি পরীক্ষা হয়েছে বরবটি, বিট, বেগুন, বাঁধাকপি, কুঁদরি, কচু, লংকা, নটে ও আপেলের। এর ভেতরে নটে ও আপেলে কীটনাশকের পরিমাণ অনুমোদিত মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

তিক্ততা বাড়লে ?

ভারতে কৃষিতে নিমের বহু ব্যবহার হয়। কিন্তু নিম তেল মাখানো ইউরিয়া ব্যবহার এই প্রথম। যা কিনা তৈরি করেছে কৃষক ভারতী কোঅপারেটিভ বা কৃভকো। ইতিমধ্যেই এই সার ব্যবহারকারীরা ভালোই ফলন পেয়েছে বলে কৃভকো দাবি করেছে। ফলে এই সারের চাহিদা বেড়েছে। জমিতে সরাসরি দেওয়া ইউরিয়া থেকে পাওয়া নাইট্রোজেনের অনেকটাই গাছ গ্রহণ করতে পারে না, নষ্ট হয়। কিন্তু নিম তেল মাখানো ইউরিয়া ব্যবহারের ফলে নাইট্রোজেনের কার্যকারিতা ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বেড়ে যায়, এমন বলছে কৃভকো। ফলে জল, মাটি ও বাতাসের দূষণ কমে। ভারতে প্রতিবছর ৭০ লাখ টন ইউরিয়া আমদানি করতে হয়। এতে অনেক বিদেশী মুদ্রা খরচ হয়। এই সারের ব্যবহার বাড়ালে বিদেশী মুদ্রাও বাঁচবে বলে কৃভকো-র দাবি।

অনুপ্রবেশ

বাংলাদেশের কৃষি মন্ত্রক বলছে, উন্নত প্রযুক্তির যুগে বাংলাদেশের খাদ্য চাহিদা মেটাতে বিটি ফসলের গুরুত্ব রয়েছে। আর এই কারণেই পাঁচটি জিন-ফসলের গবেষণার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই পাঁচটি ফসলের মধ্যে রয়েছে ২ রকমের ধান, ২ রকম আলু ও এক জাতের তুলো। এর আগে বাংলাদেশ সরকার তিন ধরনের জিন পরিবর্তিত বেগুন যেমন কাজলা, নয়নতারা ও বারি পরীক্ষার অনুমতি দিয়েছিল ২০১৩ সালের ৩০ অক্টোবর। এ নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছিল কারণ, অঞ্চল ভাগ করে মোট ২০ জন চাষিকে এই বেগুন চাষের জন্য দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র একজন চাষির ফসল ফলেছিল। বাংলাদেশে জিন-ফসলের চাষ হলে তার দূষণ থেকে পশ্চিমবঙ্গও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অনেকটা জুড়ে সীমানা রয়েছে। এই সীমানা এতই খোলামেলা যে খুব সহজেই এই বীজ এ রাজ্যে ঢুকে পড়বে। আর এটাই বীজ কোম্পানিগুলি চাইছে।

সংবাদ পরিষেবা থেকে গৃহীত

চিত্র সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত বিভিন্ন জাতের বেগুন

শুষ্ক এলাকা

বনামালা
উঃ ২৪ পরগনা

চাইনীজ লম্বা
মাকড়া বেগুন, বীরভূম

কাঁটাবেগুন
দঃ ২৪ পরগনা

লম্বা সবুজ কাঁটাবিহীন
পাঁইজা, পুরুলিয়া

মুক্তকেশি
থোপা,কাজলা

অন্ধ্রপ্রদেশ-এর এক
জৈবকৃষকের ক্ষেতের বেগুন

আর্দ্র এলাকা

উৎকলপ্রভা
পাথরপ্রতিমা
উঃ ২৪ পরগনা

সাদা থোকা ঝুরি বেগুন
উঃ ২৪ পরগনা

ময়নাকাঁটা
জলপাইগুড়ি

কালো কাঁটাযুক্ত বেগুন
উঃ ২৪ পরগনা

ছলিমাকড়া
উঃ ২৪ পরগনা

নারকেলডাঙা
জলপাইগুড়ি

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারের পক্ষে সোমজিতা চক্রবর্তী কর্তৃক ১৮বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
যোগাযোগ : প্রজেক্ট অফিস, ৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৪২, দূরভাষ : ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৪৪২ ৭৫৬৩
ই-মেল : drcsc.ind@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.drcsc.org